বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস: উৎপত্তি থেকে আধুনিক যুগ

> একটি ভাষার নিজস্ব শৃঙ্খলা আবিষ্কারের সংগ্রামী ইতিহাস– পর্তুগিজ ধর্মযাজকের হাতে যার সূচনা, বিশ শতকের ভাষাবিজ্ঞানে যার পরিপূর্ণতা।

রূপবতর-এর কাশ্মীরী ভূর্জবাকল পাণ্ডুলিপি, পাণিনি (সময়কাল ১৬৬৩ -এর সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে ব্যাকরণমূলক পাঠ্যপুস্তক) উৎস: উইকিপিডিয়া

বাংলা ব্যাকরণ হলো বাংলা ভাষার নিজেকে চেনার যাত্রার ইতিহাস। ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও বাগর্থতত্ত্ব– এই চারটি পরস্পর নির্ভরশীল বিভাগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণশাস্ত্র। কিন্তু এই বিশ্লেষণ কখনো সহজ ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালার চেষ্টা হয়েছে, অবশেষে নিজস্ব রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে এই ভাষার ব্যাকরণ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগ: সংস্কৃতের ছায়ায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বঙ্গদেশে মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণেরই চর্চা হয়েছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সংক্ষিপ্ত রূপান্তরগুলো– কাতন্ত্র, বোপদেবের মুগ্ধবোধব্যাকরণ, ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার– এ যুগের ব্যাকরণচর্চার কেন্দ্রে ছিল। সপ্তম শতক থেকে শুরু হয়ে এই ধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। বাঙালি পণ্ডিতগণের ব্যাকরণচর্চা বলতে তখন মোটামুটি এই টীকাভাষ্য রচনাকেই বোঝাত।

অষ্টাদশ শতাব্দী: বিদেশির হাতে ব্যাকরণের প্রথম আলো

বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনার কৃতিত্ব বাঙালির নয়, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের। ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনেই তারা স্থানীয় ভাষা আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ ভাওয়ালের একটি গির্জায় কর্মরত অবস্থায় (১৭৩৪–১৭৪২) রচনা করেন বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ।

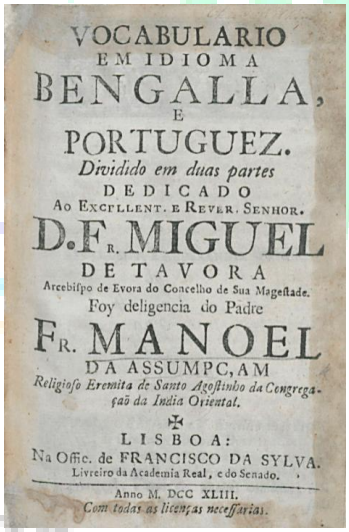

Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portuguez– ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে রোমান হরফে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি দুই অংশে বিভক্ত: প্রথম অংশে সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণ এবং দ্বিতীয় অংশে বাংলা-পর্তুগিজ শব্দাভিধান। লাতিন ব্যাকরণের আদলে রচিত এই গ্রন্থে কেবল রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে– ধ্বনিতত্ত্বের কোনো আলোচনা নেই।

দ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেন ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভনর ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুরোধে তরুণ হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে পকাশ করেন A Grammar of the Bengal Language.

গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ইংরেজিতে রচিত হলেও এটিতেই প্রথম বাংলা হরফ মুদ্রিত হয়– চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারের যৌথ উদ্যোগে তৈরি বাংলা টাইপের সাহায্যে। তাই বাংলা মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে গ্রন্থটি অমূল্য। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হ্যালহেড বাংলাকে অনেকাংশেই সংস্কৃতের ছাঁচে ফেলে বিশ্লেষণ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী: দুই ধারার সংঘাত ও সমন্বয়

উনিশ শতক ছিল বাংলা ব্যাকরণ রচনার সোনালি যুগ। এ শতকে দুটি স্বতন্ত্র ধারায় বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। প্রথম ধারায় বিদেশিরা ইংরেজিতে ব্যাকরণ লিখেছেন বিদেশিদের বাংলা শেখাতে; দ্বিতীয় ধারায় বাঙালি পন্ডিতগণ বাংলায় ব্যাকরণ লিখেছেন পাঠশালার শিক্ষার্থীদের জন্য। কিন্তু দু'দলই কম-বেশি সংস্কৃত ব্যাকরণের ছায়ায় ছিলেন।

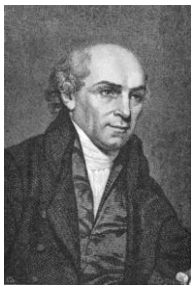
উইলিয়াম কেরি

রাজা রামমোহন রায়

- **১৮০১:** উইলিয়াম কেরি রচনা করেন *A Grammar of the Bengalee Language* – মূলত হ্যালহেডের অনুকরণে, তবে তার বাদপড়া বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে।
- **১৮২১:** জি. সি. হটন প্রকাশ করেন *Rudiments of Bengali Grammar* – হেলিবেরি কলেজের বাংলার শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত।
- **১৮২৬:** রাজা রামমোহন রায় রচনা করেন *Bengali Grammar in the English Language* – কলকাতার ইউনিটারিয়েন প্রেস থেকে প্রকাশিত।
- **১৮৩৩:** রাজা রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়– বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ।
- **১৮৪৭:** রিভারেন্ড ডব্লিউ ইয়েটস রচনা করেন *Introduction to the Bengali Language* – যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।
- **১৮৫২:** শ্যামাচরণ সরকার রচনা করেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ– যেখানে রামমোহনের অনুকরণে বাংলা ভাষাকে তার স্বরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- **১৮৯১:** জন বিমস রচনা করেন Grammar of the Bengali Language Literary and Colloquial– বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে রচিত।

  এই শতকের সবচেয়ে বিপ্লবী কণ্ঠস্বর ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ব্যাকরণকে কোনো ঔচিত্যমূলক শাস্ত্র হিসেবে দেখেননি– দেখেছেন ভাষার বিশ্লেষণ বা বর্ণনামূলক শাস্ত্র হিসেবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ককে বড়ো করে না দেখে তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রবণতা চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। ভাষার উৎপত্তি নিয়ে তার আলোচনা ছিল সেকালের বিচারে সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক।

> ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ভাষার মধ্যকার প্রচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো আবিষ্কার করা, ভাষাকে শুদ্ধরূপে লিখতে, বলতে বা পড়তে শেখানো নয়। – *রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী*

বিংশ শতাব্দী: বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সন্ধানে

বিশ শতক বাংলা ব্যাকরণচর্চাকে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উৎসাহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বাংলার অন্তর্ভুক্তি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার (১৯১৩) এবং ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮–৫২) থেকে বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা (১৯৫৫) পর্যন্ত– সবকিছু মিলিয়ে এই শতক বাংলা ভাষাচর্চায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

এ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL, 1926) বাংলা ভাষার উপাদানগুলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে। স্কুলপাঠ্য ভাষা প্রকাশ

বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৯)-এ তিনিই প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলো নির্বিচারে গ্রহণ না করে ইতিহাস ও উপযোগিতার ভিত্তিতে বিচার করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভাষার জন্য নিয়ম আরোপ করা নয়, বরং ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়ম আবিষ্কার করা।

এ শতকে বাংলা ব্যাকরণচর্চায় তিনটি প্রধান ধারা দেখা যায়: তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ এবং উপভাষা তত্ত্ব। এই তিন ধারার সমন্বয়েই আধুনিক বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের সমৃদ্ধ কাঠামো গড়ে উঠেছে।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় মুহম্মদ আবদুল হাই-এর অবদান স্মরণীয়। পঞ্চাশের দশকে ইংল্যান্ডে বাংলা নাসিক্য ধ্বনি বিষয়ে তাঁর গবেষণা এবং দেশে ফিরার পর তাঁর রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪) বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চার গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়। হুমায়ুন আজাদ-এর বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪) চমস্কির রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের ধারণাকে বাংলা ভাষায় সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপভাষা চর্চায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১৯৬৫) এক অতুলনীয় কীর্তি। পশ্চিমবঙ্গে সাংগঠনিক ব্যাকরণ নিয়ে কাজ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, সুহাস চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার প্রমুখ। বাংলাদেশেও সমাজ ভাষাবিজ্ঞান ও উপভাষা গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস একটি সরল রেখায় এগোয়নি– এ এক বহুস্রোতা নদীর মতো প্রবাহিত যাত্রা। পর্তুগিজ ধর্মযাজকের হাতে যে বীজ বপন হয়েছিল, বিদেশি পণ্ডিত ও দেশীয় মনীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তা বটবৃক্ষ হয়েছে। সংস্কৃতের আধিপত্য থেকে মুক্তি, নিজস্ব প্রকৃতির আবিষ্কার এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মেলবন্ধন– এই তিনটি ধাপে বাংলা ব্যাকরণ আজকের রূপ পেয়েছে।

তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটেনি। বাংলা ব্যাকরণচর্চা এখনও এগিয়ে চলেছে নতুন গবেষণা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

ভাষার মতোই এর ব্যাকরণও জীবন্ত, গতিশীল এবং চিরবিবর্তনশীল।

NABARUN PUBLICATION

গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন–২ **ভাষা ব্যবহারে কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের গুরুত্ব কতখানি? বুঝিয়ে লেখো।** *[রা. বো. '০১]*

উত্তর:

মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভাষা। এ ভাষা কণ্ঠস্বরের নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই ভাষা ব্যবহারে কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের গুরুত্ব অনেক বেশি। কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, কাঁপন, টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা বাক্যের বিশেষ বিশেষ অর্থ ও ভাব প্রকাশিত হয়। আবেগের তারতম্যে, ইচ্ছার বৈচিত্র্যে কণ্ঠস্বরে ওঠানামা সৃষ্টি হয়। ধ্বনিগুলো তখন কেবল বাক্‌প্রত্যঙ্গের যান্ত্রিক আওয়াজ বলে মনে হয় না; তখন তা হয়ে ওঠে আমাদের ইচ্ছা আর আবেগের প্রতিরূপ। বক্তার কথায় বা বক্তৃতায় যদি স্বরভঙ্গির বৈচিত্র্য না থাকে, তবে তার কথা শ্রোতার কাছে হয় অস্পষ্ট, একঘেয়ে, নীরস ও বিরক্তিকর। স্বরভঙ্গির গুণে বক্তার কথা হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় ও রসালো। এ কারণে ভাষা ব্যবহারে কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব অপরিসীম।

কণ্ঠ বা বাগ্‌যন্ত্র ছাড়া যেমন ভাষার মৌখিক রূপ প্রকাশ সম্ভব নয়, তেমনি ভাষা প্রকাশে উচ্চারণ সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা না থাকলে কিংবা অস্বচ্ছ ধারণা থাকলে আধুনিক কালে ভাষা শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তাই উচ্চারণ বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক ও শুদ্ধ উচ্চারণ। বাংলা ভাষায় অনেক বর্ণের চেহারা ও রূপ এক হলেও উচ্চারণ এক নয়। এগুলোর সঠিক উচ্চারণের জন্য প্রয়োজন সঠিক স্থান থেকে বর্ণ উচ্চারণ। উল্লেখ্য, উচ্চারণ হলো বাক্‌শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উচ্চারণের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে, সঠিক উচ্চারণের সূত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং এর চর্চা বা অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন–৩ **ব্যাকরণ কাকে বলে? ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।**

[ব. বো. '০৫; রা. বো. '০২; চ. বো. '০১; ঢা. বো. ২০০০; কু. বো. '১০, ২০০০; য. বো. '০৪]

অথবা, **ব্যাকরণ কী? ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক আমরা কেন ব্যাকরণ পড়ব– আলোচনা করো।**

উত্তর:

ব্যাকরণ: যে শাস্ত্র দ্বারা ভাষার স্বরূপ ও গঠন-প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়, ভাষাকে সুবিন্যস্ত করা যায় এবং ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপণ করা যায়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

প্রতিটি ভাষারই নিজস্ব নিয়ম আছে। আর সেই নিয়মের ওপর ভিত্তি করেই প্রত্যেক ভাষার জন্য নিজস্ব ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। বাংলা একটি প্রাচীন ভাষা। এ ভাষারও রীতিনীতি আছে এবং এ ভাষার জন্য আছে আলাদা ব্যাকরণ। সুতরাং, যে শাস্ত্র বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন-প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এবং এগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচনা করে ভাষার গঠন, পঠন ও লিখনে শৃঙ্খলা ও পরিশুদ্ধি আনয়ন করে, তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা:

১. **ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি জানা:** ভাষার মাধ্যমে মনের ভাবকে প্রকাশ করতে হলে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, ব্যাকরণ ভাষার স্বরূপ বা প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করে ভুল-ত্রুটি পরিহারের মাধ্যমে শুদ্ধতা নিশ্চিত করে।

২. **ঠিক উচ্চারণ ও বানান শেখা:** ভাষা লেখার জন্য যেমন বর্ণের প্রয়োজন, তেমনি উচ্চারণের জন্য ধ্বনির প্রয়োজন। এই বর্ণ ও ধ্বনিগুলোর ঠিক উচ্চারণ ও স্থাপন ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। বাংলা ভাষায় 'ণ', 'ন', 'শ', 'ষ', 'স'-এর প্রচলন আছে। এছাড়া প্রচলন আছে 'উ', 'ঊ' এবং যুক্তবর্ণের। এগুলোর উচ্চারণ পার্থক্য, বানানবিধি ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

৩. **শব্দের ব্যবহার, গঠন ও অর্থ নির্ণয়:** শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দের ঠিক অর্থ নিরূপণের জন্য এবং নতুন শব্দ কোন কোন উপায়ে গঠিত হয়, সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন। শব্দ গঠনের উপায় হচ্ছে উপসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস। ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

৪. **বাক্য গঠন ও ভাব প্রকাশ:** শুধু শব্দ নয়, বাক্য গঠন এবং বাক্যের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন রয়েছে। বাক্যের সাধারণ অর্থ, ব্যঞ্জনাময় অর্থ ও ভাবার্থ রয়েছে। তাছাড়া সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য গঠন প্রক্রিয়া বাক্যতত্ত্বের বিষয়াধীন। অনেক সময় একই পদ বাক্য গঠন কৌশলে কখনো বিশেষ্য, কখনো বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। উক্তি পরিবর্তন ও বাগ্‌ধারার ব্যবহার ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্ব থেকে জানা যায়।

৫. **কবিতা এবং গানের ছন্দ ও অলংকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন:** মানুষের ভাব প্রকাশের বাহন কেবল গদ্যই নয়; বরং কবিতাই সাহিত্যের প্রধান শাখা। আর এই কবিতা ও গানের ছন্দ ব্যাকরণেরই বিষয়ভুক্ত। ছন্দের শুদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যাকরণ নির্দেশ করে। এছাড়া ভাষার অলংকার প্রয়োগেরও একটি নিয়ম আছে। ব্যাকরণ এর প্রয়োগ-পদ্ধতি নিরূপণ করে দেয়। অলংকার প্রয়োগের ফলে ভাষা শ্রুতিমধুর ও প্রাঞ্জল হয়।

৬. **সাহিত্যের দোষ-গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ:** সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সাহিত্যের দোষ, গুণ, রীতি, অলংকার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে হলে ব্যাকরণ পাঠের কোনো বিকল্প নেই।

সুতরাং, বলা যায়, ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না কিংবা নির্মাণও করে না। তথাপি ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যা উল্লিখিত আলোচনা হতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন–৪ **'ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ।'– আলোচনা করো।**

[রা, বো. '১৫; চ. বো. '০৬; য. বো. '০২; সি. বো. '০৮, '০১; রা. বো. ২০০০]

অথবা, **'ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, নির্মাণও করে না, তবু ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।' বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।** *[সি. বো. '০২]*

অথবা, **'ভাষা ব্যাকরণ অনুসরণ করে না, ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে।'– আলোচনা করো।**

[য. বো. '০৩; চ. বো. '০২; ব. বো. '০১]

উত্তর: ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার মানেই ব্যাকরণ। ভাষা আগে এসেছে, আর ব্যাকরণ এসেছে অনেক পরে। বাংলা ব্যাকরণের বয়স মাত্র আড়াইশ বছর, যেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স হাজার বছর। ভাষা সৃষ্টি হওয়ার পর এর নিয়ম-কানুনকে একত্রে শ্রেণিবদ্ধ করে ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়েছে। ভাষার একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে গেলে ব্যাকরণের মাধ্যমে এর স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। ভাষা কখন কীরূপ হওয়া উচিত, ব্যাকরণ তার নির্দেশ না দিয়ে বরং ভাষার মধ্যে কী আছে তা পর্যালোচনা করে। অন্য কথায়, ব্যাকরণ ভাষার কোনো ব্যবস্থাপত্র বা নির্দেশ দান করে না; বরং যে নিয়মে বা যেভাবে ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত, সেই নিয়মটি শুধু বলে দেয়।

ব্যাকরণের এ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বলা যায়, ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং ভাষাই ব্যাকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষাকে যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে রক্ষার উদ্দেশে ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে। সে কারণে যার যেমন খুশি তেমনভাবে ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। সকলকে অবশ্যই ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন মানতে হয়। তবে ভাষার স্বাভাবিক গতিপ্রবাহের পরিণতিতে নিয়ম-কানুনের যেসব পরিবর্তন ঘটে, তা ব্যাকরণকেও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হয়।

ভাষা নদীর গতিশীল জলধারার মতো প্রবহমান। এ প্রবহমানতাই ভাষার প্রাণ। মুখে মুখে ভাষা ব্যবহারে যে পরিবর্তন ঘটে তাতে অনেক সময় নতুন নিয়মের সৃষ্টি হয়। সে নিয়ম কালক্রমে ব্যাকরণের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভাষার গতিপথ পর্যালোচনা করলে সহজেই মনে হবে যে, ধ্বনি, শব্দ ও রূপতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবসময় একটিমাত্র রূপ বিদ্যমান থাকেনি। প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন থেকে আধুনিক কালের বাংলা ভাষাভাষীরা বহু দূরে সরে এসেছে এবং আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সাম্প্রতিক ব্যাকরণের উপজীব্য হয়েছে। ভাষা যে ব্যাকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তা এ বৈশিষ্ট্য থেকে অবহিত হওয়া যায়।

ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষাবিজ্ঞান; কারণ ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে এর বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে। প্রত্যেক ভাষায় কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে। ইচ্ছেমতো ভাষা প্রয়োগ করলে ভাষায় শৃঙ্খলার অভাব ঘটে এবং ভাষা বোধগম্যতা হারায়। ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষার স্বরূপ, প্রকৃতি ও ব্যবহার-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার বিধান দেওয়া। ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা জানা থাকলে ভাষাপ্রবাহ বজায় থাকে। ভাষার ব্যবহারে এর বিশেষ কিছু নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। এ নিয়মগুলোই ব্যাকরণের নিয়ম। ব্যাকরণের এ নিয়মগুলো ভাষার শৃঙ্খলা বজায় রাখে বা ভাষাকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখে। এ কারণে ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়। তাই ভাষার বিশুদ্ধতার জন্য ব্যাকরণের সহায়তা প্রয়োজন। ভাষা তার নিজের গতিতে চলে বলে কখনো কখনো ব্যাকরণের বিধি-বিধান অতিক্রম করে যায়। তবু ব্যাকরণই ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট গতি প্রদান করে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পথ চলতে শেখায়। অতএব, কোনো ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং বিধিপদ্ধতির আবিষ্কার করে ভাষাকে সুশৃঙ্খল রাখাই ব্যাকরণের কাজ।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে। আর ব্যাকরণ মনের ভাব বা ভাষাকে বিশুদ্ধ ও মার্জিতরূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। কাজেই ভাষা ব্যাকরণের দাসত্ব করে না; বরং ব্যাকরণকে ভাষাই শাসন করে। কারণ ভাষা ছাড়া ব্যাকরণ হয় না। এ কারণে ভাষাকে কেন্দ্র করেই ব্যাকরণের আবির্ভাব। ভাষার যখন সৃষ্টি হয় তখন তা কোনো ব্যাকরণকে অনুসরণ করে সৃষ্টি হয় না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মুখের ভাষায় এসেছে অসংখ্য পরিবর্তন। ভাষার এ পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাকরণও পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যাকরণ যদি ভাষাকে শাসন করতো, তাহলে ব্যাকরণে পরিবর্তন আসত না; বরং ভাষার জন্য যখন যে আইন তৈরি করা দরকার ব্যাকরণ তা করেছে। নিজেকে পরিবর্তিত করেছে। কাজেই বলা যায়, ভাষা ব্যাকরণ অনুসরণ করে না; বরং ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে।